

উৎস ও বিবর্তনের আলোয় পুরুলিয়ার সাঁওতাল সম্প্রদায়
স্বপন কুমার

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/07/23_Swapan-Kumar.pdf

সারসংক্ষেপ: পুরুলিয়া তথা মানভূমের সাঁওতাল জাতি বর্তমানে নিজেদেরকে সভ্যতার আলোয় আলোকিত করেছে। সাঁওতাল শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে নানা গুণীর নানান মতামত। কেউ মনে করেন ‘সাঁত’ বা ‘সামন্ত’ থেকে হিন্দিতে ‘সাঁওতাল’ শব্দটি এসেছে, আবার অনেকে বলেছেন ‘শ্যামতাল’ থেকে ‘সাঁওতাল’ শব্দটি এসেছে। তবে সাঁওতাল জাতির আদি উৎস হিহিড়ি পিপিড়ি নামের কোনো এক জায়গা যা ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি অবস্থিত। সাঁওতাল সমাজে পুরুষদের বলা হয় ‘মাঝি’ এবং মহিলাদের ‘মেঝেন’। এই ‘মাঝি’ শব্দটির মাধ্যমে সাঁওতাল সমাজে মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিকে বোঝায়। তাঁরা নিজেদেরকে ‘হড়’ জাতি বলেও পরিচয় দেন। ‘হড়’ শব্দের অর্থ মানুষ। মাঝির কাজ হলো গ্রামের সমস্ত রকমের সমস্যার সমাধান করা, কারণ সে উপর। এছাড়াও তাদের সামাজিক জীবনে রয়েছে নানান বৈচিত্র্য — বর্তমান প্রবন্ধে যা আলোচিত হয়েছে। আলোচনার নিরিখে বলা যায় যে, এই সম্প্রদায়ের মানুষগুলো মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। যদি আপামর জনসাধারণ তাদের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেন তাহলে অবশ্যই তারা নিজেদেরকে আধুনিকতার ভাবধারায় ভাবিত করবে। তারা নিজেদের অধিকার গ্রহণ করে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের পথে হাটবে।

সূচক শব্দ: আদিম, জনজাতি, সাঁওতাল, মানভূম, আদিবাসী।

ভারতবর্ষের আদিম জনজাতি সমগ্র পৃথিবীর মানবজাতির অংশবিশেষ। এই দেশের আদিবাসীকে নৃতাত্ত্বিকেরা বিজ্ঞানসম্মত পরিভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা মনে করেন আদি অস্ট্রালরাই ভারতের আদিম জাতি। কারণ অস্ট্রেলিয়ার আদিম জনজাতির সঙ্গে ভারতের আদি অস্ট্রালদের দেহের গঠনগত মিল আছে। আদি অস্ট্রাল জাতি দেখতে অনেকটাই খর্বাকৃতি, নাক চ্যাপ্টা ও চওড়া, রং কালো, মাথার চুলগুলো ঢেউ খেলানো। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের আদিবাসীরা প্রটো অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর মানুষ। যেমন মুন্ডা, কোল, ভীল, কোরোয়া, ভূমিজ প্রভৃতি জাতি এই গোষ্ঠীর। স্বভাবতই কোল বলতে বোঝায় সাঁওতাল, ভূমিজ, মুন্ডা, হো প্রভৃতি জাতিকে। মধ্যযুগের সাহিত্যে রয়েছে কালকেতু, ফুল্লরা প্রাচীন অস্ট্রিক সমাজের সদস্য। ব্যাধ, নিষাদ, পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি জাতির উল্লেখ পায় মধ্যযুগের সাহিত্যে এরা আদি অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মানভূম তথা পুরুলিয়ার অনেক জনজাতি রয়েছে কিন্তু বর্তমানে যে কয়েকটি জনজাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান, তাদের মধ্যে অতি উল্লেখযোগ্য জনজাতি সাঁওতাল জনজাতি।

পুরুলিয়া তথা মানভূমের সাঁওতাল জাতি বর্তমানে নিজেদেরকে সভ্যতার আলোয় আলোকিত করে এগিয়ে যাচ্ছে নিজস্ব কঠোর পরিশ্রমে। সাঁওতাল শব্দটি কোথা থেকে এসেছে তা নিয়ে নানা গুণীর নানান মত। কেউ কেউ মনে করেন ‘সাঁত’ বা ‘সামন্ত’ থেকে হিন্দিতে ‘সাঁওতাল’ শব্দটি এসেছে। আবার অনেকেই বলেছেন ‘শ্যামতাল’ থেকে ‘সাঁওতাল’ শব্দটি এসেছে। সাঁওতাল পুরুষদেরকে বলা হয় ‘মাঝি’, মহিলাদেরকে ‘মেঝেন’ বলতেও আমরা শুনে থাকি। ‘মাঝি’ শব্দটির মাধ্যমে সাঁওতালদের সমাজে মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিকে বোঝায়। তাঁরা নিজেদেরকে ‘হড়’ জাতি বলেও পরিচয় দেন। ‘হড়’ শব্দের অর্থ মানুষ। সাঁওতাল জাতির আদি উৎস হলো হিহিড়ি পিপিড়ি নামের কোনো এক জায়গা যা ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি অবস্থিত। এই জাতির আদিবাসস্থান যে হিহিড়ি পিপিড়ি স্থানে ছিল তা অনেক অজানা কবির রচিত গান দ্বারা ব্যক্ত হয় এবং সেগুলো এখনো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের মুখে প্রচলিত রয়েছে। এই সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে জানা

যে, তারা জন্মেছিল হিহিড়ি পিপিড়িতে, মিলিত হয় খজ কামানে, সংগঠিত হয় তারা হারাতাতে এবং জাতিকরন হয় সাসাংবেডায়। সাঁওতালীর অনেক গানই তার স্পষ্ট চিত্র প্রতিফলিত হয়। যেমন,

“হিহিড়ি পিপিড়ি রে বোন জানাম লেন
খজ কামান রে বোন খজ লেন
হারাত বুরু রে বোন হারালেন
সাসাং বেডা রে বোন জাত এনা হো।”^১

সাঁওতাল জাতি হারাতা পর্বত থেকে একসময় সাসাংবেডা নামের এক জায়গায় চলে আসে। সেখানেই তাঁদের গোত্র বিভাজিত হয়। তারপরে তাঁরা জারপি দেশ, ইরান, কঁয়ডা অর্থাৎ আফগানিস্তানে চলে যায়।

পূর্ব আফগানিস্তান ‘গান্ধার’ বা ‘কান্দাহার’ নামে পরিচিত ছিল। এই সমাজের অনেক প্রাচীন গীতে কান্দাহার বা গান্ধার দেশের নাম পাওয়া যায়। যেমন —

“চেতে লাগিৎ মাপাঃ কানা ক কঁয়ডাকো
ধাঁও ধাঁও কান্দাহারি রে,
চেতে লাগিৎ গপচ্ কানাক বাদোলী কো
ধাঁও ধাঁও কান্দাহারি রে?
সিমা লাগিৎ মাপাঃ কানাক কঁয়ডা কো
ধাঁও ধাঁও কান্দাহারি রে
ডাভি লাগিৎ গপচ্ কানা কো বাদোলী কো
ধাঁও ধাঁও কান্দাহারি রে।”^২

অর্থাৎ গান্ধার দেশে কেন কঁয়ডারা কাটাকাটি করছে, বাদোলীরা কেন মারামারি করছে গান্ধার দেশে? কঁয়ডারা কাটাকাটি করছে সীমার জন্য এবং বাদোলীরা মারামারি করছে বাস্তুর জন্য গান্ধার দেশে।

গান্ধারে সাঁওতাল জাতি বসবাস করত, সেখানে তাদের সমাজচিত্রের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে রাজত্ব করত কিস্কুরা। ব্যবসা-বাণিজ্য করত মাভিরা, লোহার কাজ করত টুডু গোত্রের মানুষেরা, পূজা-অর্চনা করত মূর্মু জাতির লোকেরা, তাঁরা তাদের সমাজে ঠাকুর হিসেবে পরিগণিত হতো। দেওয়ানের কাজ করত হেমব্রমরা, চাষাবাদ করত হাঁসদা জাতির লোকেরা, দেশ রক্ষার কাজ করত সোরেন জাতির মানুষগণ। হঠাৎ একসময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে চম্পা রাজ্য ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। ফলে সেখান থেকে তারা উদ্বাস্তু হয়ে আসে বর্তমানে বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্রের পাশাপাশি নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশেও অনেক সাঁওতালি মানুষের দেখা মেলে। তবে সাঁওতালরা প্রথম কোথা থেকে এসেছিল তার কোনো পাথুরে প্রমাণ নেই। যাই হোক অনেক কিছু বিষয়কে মাথায় রেখে অনুমান করা যায় যে আদিম সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষ ভারত ও পাকিস্তানের বিহার, পাঞ্জাব, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করছে।

মোট বারোটি পদবী রয়েছে সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীতে সেগুলি হলো — কিস্কু, মাভি, হাঁসদা, মূর্মু, হেমব্রম, সোরেন, টুডু, বাস্কে, বেসরা, চঁড়ে, বেদিয়া, পাঁওরিয়া। খুব কম সংখ্যক সাঁওতাল দেখা যায় বেদিয়া, চঁড়ে, পাঁওরিয়া পদবীগুলোতে। তবে এটা মনে রাখা প্রয়োজন প্রতিটি পদবীর অনেক ধরনের উপ-পদবী আছে। সাঁওতাল জনসাধারণ তাদের প্রধান নির্বাচিত করেন কোনো ভোটের মাধ্যমে নয়, সকলে মিলে যার উপর খুব বেশি ভরসা পায় সেই ব্যক্তিকে। এইভাবে তারা গ্রাম প্রধান মাঝি বা মোড়লকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মাঝির কাজ হলো গ্রামের সমস্ত রকমের সমস্যার সমাধান করা, তাঁর উপর আর কেউ নেই। মাঝির সঙ্গে বেশ কয়েকজন লোক দেখা যায়, তাদের নিজস্ব কিছু কাজ থাকে গ্রামে। তারা হলো পারানিক, জগমাঝি, জগ-পারানিক, গডেত, নায়কে, কুর্ডাম নায়কে। পারানিকের কাজ হলো মাঝির অনুপস্থিতিতে গ্রামের সর্বময় কর্তার অধিকারী হওয়া।

জগমাঝির কাজ হলো গ্রামের ভবিষ্যৎ যারা অর্থাৎ যুবক-যুবতীদের সঠিক পথ দেখানো। জগমাঝিকে সর্বময় কাজে সাহায্য করাই হলো জগ-পারানিকের কাজ। মাঝির এক প্রকার দূত বলা যায় গড়েতকে। যে কোনো সভায় তাঁর কাজ হলো গ্রামের সকলকে এক জায়গায় ডেকে আনা। গ্রামের যাবতীয় পূজা-পার্বণ করেন নায়েকে। আবার নায়েকের সাহায্যকারী হলো কুর্ডাম নায়েকের। কোনো জটিল সমস্যার সমাধান যখন মাঝি করতে পারেন না তখন তা চলে যায় পারগানার কাছে। কয়েকটি গ্রাম মিলে হয় পরগনা এবং পরগনার শাসনকর্তাকে বলা হয় পারগানা। প্রত্যেকটি পরগনায় একটি দেশ মাঝি থাকে। সমস্ত পরগনার কথা ভাবনা চিন্তা করাই হলো এই দেশমাঝির কাজ। আবার জাতীয় শিকারে যারা অংশগ্রহণ করে তাকে বলে দিহরি।

কোল বা মুন্ডা গোষ্ঠীর দুটি ধারা পূর্বাঞ্চলীয় এবং পশ্চিমাঞ্চলীয়। পূর্বাঞ্চলীয় ধারায় রয়েছে মোট ছয়টি ভাগ। যথা — কোড়া, হো, ভূমিজ, মুন্ডারী, কোরোয়া এবং সাঁওতাল। বর্তমানে ভারতবর্ষের আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অধিক। স্বাধীন ভারতের সাঁওতাল ভাষাঞ্চল দু'ভাগে বিভক্ত যথা — Northern Santali এবং Southern Santali। আসলে সাঁওতালি ভাষাভাষি মানুষ দেখা যায় উড়িষ্যা, ময়ূরভঞ্জ, হাজারিবাগ, সিংভূম, পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, মালদহ প্রভৃতি জায়গায়। ১৯২৫ সালের রঘুনাথ মূর্মু এই ভাষার উপযোগী 'অলচিকি' লিপির উপর জোর দেন। এই লিপি অনেকদিন পর্যন্ত অবহেলিত ছিল। পরবর্তীকালে 'আদিবাসী সোসিও এডুকেশনাল এন্ড কালচারাল এসোসিয়েশন' এই লিপি প্রচারের জন্য আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়। আন্দোলনের চাপে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৯ সালে এই লিপি নীতিগতভাবে স্বীকৃতি দেন। তারপর থেকে এই লিপির জোয়ার ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত জায়গায়। বর্তমানে লক্ষ করা যায় অনেক বিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষায় পঠন পাঠানের চিত্র।

সাঁওতাল সমাজে একটি কথা বেশ প্রচলিত আছে, তা হলো — লেখার থেকে শ্রুতিই শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই বোধহয় সাঁওতাল সাহিত্য শ্রুতির আকারেই চলে আসছে। তাদের জীবনের মূল ঐতিহ্য হলো বাড়ির দেয়ালে, গরু-মহিষের শরীরে বিভিন্ন সাংকেতিক চিত্র অঙ্কন করা। সাঁওতাল সাহিত্য রচনা শুরু হয় মানুষের মুখে মুখে, তাকে আমরা লোকসাহিত্য নামে চিহ্নিত করি। লোকসাহিত্য বলতে আমরা জানি গীত, ছড়া, প্রবাদ, হেঁয়ালি, প্রবচন ও নানান ধরনের কাহিনি। এগুলো আলোচিত হতো সন্ধ্যায় প্রতি ঘরে ঘরে ঠাকুরদা বা ঠাকুরমা তাদের নাতি-নাতনিদের সঙ্গে। বর্তমানে যদিও এই চিত্রটির প্রমাণ আর দেখা যায় না। লিখিত সাহিত্য এই সমাজে শুরু হয় ইংরেজদের আসার পর থেকেই। প্রথমে ইংরেজগণ এই সাহিত্যের ক্ষেত্র বিচরণ করলেও পরবর্তীকালে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অনেক পণ্ডিত কলম ধরেন। সাঁওতালদের মধ্যে প্রথম লেখনী ধরলেন সিংভূমের রামদাস টুডু রেসকা। তিনি রচনা করলেন 'খেরওয়াল বংশ ধরম পুঁথি' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। এটিই হলো সাঁওতালদের প্রচেষ্টায় প্রথম পুস্তক। এরপর একে একে নামজাদা কবিগণ এই সাহিত্যে বিচরণ করেন। যেমন শিলদার মহাকবি সাধুরাম চাঁদ মূর্মু, হিকিম মূর্মু, উড়িষ্যার পণ্ডিত রঘুনাথ মূর্মু, পুরুলিয়ার রাজেন্দ্রনাথ মাঝি প্রমুখ।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই বিহার সরকারের তত্ত্বাবধানে 'হড় সম্বাদ' নামে এক সাঁওতাল পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'পশ্চিম বাংলা' নামে একটি সাঁওতাল পত্রিকাতে অনেক লেখক হাত পাকাচ্ছেন। অসাঁওতাল বুদ্ধিজীবীগণ সাঁওতাল সাহিত্যে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরছেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী, সুধীর মিত্র, ড. পরিমল চন্দ্র মিত্র প্রমুখ। এছাড়াও অনেকেই মনে করেন যে পুরুলিয়া হলো সাঁওতাল সাহিত্যের উৎপত্তিস্থল। সাঁওতাল সমাজের বিখ্যাত কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু পুরুলিয়া জেলার লোক। তিনি রচনা করেন 'ভুর্কা ইপিল' (১৯৫৩), 'কুহুবাও' (১৯৬০), 'গাম-গাঁদার' (১৯৬৭), 'লাহাঃহররে' (১৯৮৫), 'বিদাঃ বেড়া', 'সলম লটম', 'সজ্জীতিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ। এছাড়াও তিনি দুটো পত্রিকার সম্পাদনা করতেন 'খেরওয়াল আড়াং' এবং 'সুসার ডাহার' পত্রিকা। পুরুলিয়া থেকে যেসব সাঁওতাল পত্রিকা প্রকাশিত হতো সেগুলি হলো ঝারনা, ডাহার, তেতরে, শিলি, উমুল, রায়নার, গিরু, যুগ ঝারনা প্রভৃতি। তবে এখনো 'সিলি' পত্রিকাটি সচল রয়েছে।

পুরুলিয়ার আসল পরিচিতি ওখানকার আদিবাসী ও তাদের জীবনচর্যয় প্রতিফলিত সংস্কৃতি। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানভূমের মানুষের উন্নতি হলেও ওখানের আদিবাসীর অধিকাংশই রয়ে গেছে সেই অ-শিক্ষার অন্ধকারে। এখনো দুবেলা খাবারের স্থানে অতিবাহিত হয় সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে জনজাতি সংক্রান্ত চিন্তা-চেতনারও বিকাশ ঘটেছে ধীরে ধীরে। জনজাতিগুলির উন্নয়নের জন্য সরকার বা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা একক ও যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন কর্মসূচি আদিবাসীদের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা রূপায়িত হয়েছে খুব অল্পই। মানভূম তথা পুরুলিয়াতে অনেক জনজাতির বসবাস লক্ষ করা যায়। অন্যান্য জনজাতি থেকে যে জাতি সম্প্রদায় নিজেদেরকে বর্তমানের সমান্তরাল পথে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছে তারা হলো সাঁওতাল সম্প্রদায়। তাদের জীবনের বিবর্তিত চিত্র আমাদের চোখে প্রতিফলিত হয়।

লোকালয়ে অবস্থান করার ফলে তাঁদের প্রধান পরিবর্তিত বিষয় হলো ভাষা। আমরা জানি ভাষা হলো ভাব বিনিময়ের মাধ্যম। সাঁওতালরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলে তখন নিজস্ব ভাষায় প্রয়োগ করে। এরপর যখন তারা অন্যত্র কোনো কাজে বাইরের মানুষের সঙ্গে কথা বলে তখন স্থানীয় বাংলার বা যে কোনো উপ-ভাষায় কথা বলে। তবে তা একেবারে সম্পূর্ণরূপে উচ্চারিত হয় না, একটু অস্পষ্টতার ছাপ লক্ষ করা যায়। ফলে বোঝা যায় তাদের নিজস্ব ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাতেও কথা বলার স্পষ্ট চিত্র। তাদের নিজস্ব ভাষা সমকালীন মানুষ খুব কম আছে যারা বোঝে কিন্তু সিংহভাগ মানুষই বুঝতে অসক্ষম। ফলে বাধ্য তাদের স্থানীয় বাংলা ভাষার আঞ্চলিক উপভাষায় কথা বলতে। যেমন দোকানে, হাটে-বাটে, স্কুলে-কলেজে, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথাবার্তায় ফুটে উঠে আঞ্চলিক উপভাষা। তাদের সম্প্রদায়ের অধিকাংশই বেরিয়ে আসতে চায় যুগোপযোগী ভাবনার আওতায়। এছাড়াও বড়ো আনন্দের কথা হলো যে, ২০০৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর সাঁওতালি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমগ্র সাঁওতাল সমাজের কাছে এটি একটি বিরাট জয়ের বিষয়। বলতে কোনো দ্বিধাবোধ নেই, এই ভাষার এরকম বৃহৎ ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও এর পূর্বে খুব বেশি মর্যাদা পেয়েছে বলে ভাবা যায় না। এর পিছনে রয়েছে বহু আন্দোলন, নানান মিছিল, অনেক অনেক ডেপুটেশন তবে গিয়ে একসময় এই ভাষা কেন্দ্র সরকার কর্তৃক অন্যান্য বৃহৎ ভাষার মতো মর্যাদা অর্থাৎ জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ সম্মান এসেছে কিছুটা নাটকীয়তা ও টালবাহানার পথ ধরেই, খুব সহজে এই মর্যাদা দিতে কেউ রাজি হয়নি।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার এক পরিবর্তিত চিত্র হলো শিক্ষা। আমরা সকলেই অবগত যে আদিতে শিক্ষা জগত থেকে শত ক্রোশ দূরে থাকত এই সম্প্রদায়ের লোকজন। কিন্তু বর্তমানে লোকালয়ে থাকার ফলে তাদের ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়মুখি হয়েছে। পূর্বে হয়ত দু চারজন চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করত কিন্তু এখন অনেকেই উচ্চশিক্ষার জগতে পৌঁছে গেছে। এই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকজন অনেক জায়গায় চাকুরি জগতে রয়েছেন, নিজেদেরকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন সকলের সম্মুখে। পূর্বে বাঁকুড়া জেলায় কয়েকটি বিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষার শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল এবং সাঁওতালি ভাষার ছেলেমেয়েদেরকে পড়ানোর উদ্দেশ্যে অলচিকি হরফে কিছু পাঠ্যপুস্তকও তৈরি হয়েছিল। সেসময় আংশিক অসুবিধা থাকার ফলেই পঠন পাঠনের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়নি। পরবর্তীকালে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে নবভাবে এই সম্প্রদায়ের পড়াশোনার দিকে নজর দেওয়া হয়। এই ভাষায় পড়ানো যাবে কিনা তা নিয়ে খতিয়ে দেখার জন্য পবিত্র সরকারের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়, তার নাম ‘সাঁওতালি ভাষা কমিটি’। সরকারের কাছে তথ্য এসে যায় যে নবম ও দশম শ্রেণির সিলেবাসের কিছু পুস্তক আছে কিন্তু বাংলা হরফে পুস্তক ছাপানো হওয়ায় ভীষণ প্রতিবাদ শুরু হয়। এই প্রতিবাদের ফলেই একসময় সাঁওতালি ভাষায় শিক্ষা প্রদান স্তম্ভিত হয়ে যায়। ওই সময়েই ঝাড়খণ্ডের রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ভাগলপুরে তিলকা বিশ্ববিদ্যালয়, দুমকায় সিধু-কানু বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষায় বি.এ. ও এম.এ. পড়ানো হয়। সেখানে দেবনাগরী ও অলচিকি দুটো হরফেই ব্যবহৃত হয়। ফলে একসময় লক্ষ করা গেছে যে সাঁওতালি ভাষায় শিক্ষাদান জটিল পথেই হেঁটেছে। কিন্তু বর্তমানে লক্ষ করা

যায় এই ভাষায় পড়াশোনার পথ সুগম হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সমাজের ছেলেমেয়েরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা অবিরাম করে চলেছে। অন্যান্য জনজাতির থেকে তারা যে এগিয়ে তা প্রমাণ মিলে এই সমাজের ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিতিতে। তারা নিজেদেরকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে চলেছে ফলে দেখা যায় তাদেরকে অনেক বিদ্যালয়ে, কলেজে, অফিসে, আদালতে, চাকুরি জগতে। পূর্বের সাঁওতাল সমাজ পাড়ি দিয়েছে এক সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে। নিজেদের অধিকারকে জানতে শিখেছে এবং প্রতিবাদ করে তা আদায় করার পক্ষেও বন্ধপরিকর হয়েছে।

মানভূম তথা পুরুলিয়ার সাঁওতাল সমাজ সাহিত্যের দিক থেকেও খুব একটা পিছিয়ে নেই। কোনো এক সময় এখান থেকে অনেক সাঁওতালি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। যেমন ঝাংগা, তেতরে, সিলি, রায়বার, গিরু, তিরায়ী প্রভৃতি। এই পত্রিকাগুলোতে যেমন তৎকালীন সাঁওতাল সমাজের নামজাদা লেখকগণ তাঁদের লেখনীতে তুলে ধরতেন সমকালীন সমাজব্যবস্থাকে তেমনি বর্তমানে যেসব পত্রপত্রিকা প্রচলিত রয়েছে সেখানে দেখা যায় নিজেদের অস্তিত্বের সংগ্রাম, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন তাঁদের কলমে। তাঁদের আবেদন রয়েছে, নিজেদের অস্তিত্বকে কয়েম করার, আপামর জনসাধারণের স্বার্থ চরিতার্থ করা, সর্বোপরি নিজেদের অধিকারকে যেকোনো উপায়ে আয়ত্ত করা। এই প্রসঙ্গে একথা বলা যায়, যেরকমভাবে তাঁরা নিজেদের সমস্যাকে প্রতিবাদের মাধ্যমে আধুনিক সমাজের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন তেমনি সাহিত্যের মাধ্যমেও তারা নিজেদের সমস্যাকে সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত করেই চলেছেন।

জীবনধারণের ক্ষেত্রেও তাদের বিবর্তিত চিত্র চোখে পড়ে। একেবারে গোড়ার দিকে সাঁওতালদের দিনাতিপাত করার একমাত্র উপায় ছিল শিকার করা। পরবর্তীকালে তাদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন হলো বনজ ফল-মূল-পাতা ইত্যাদি বাজারে বিক্রি করা। এগুলো বিক্রি করেই তারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাজার থেকে নিয়ে আসত। বর্তমানে দেখা যায় সাঁওতাল সমাজের মানুষ চাষবাস, পশুপালন ছাড়াও অন্যান্য মানুষের কাজ করে টাকার বিনিময়ে। তারা নিজেদের চাষবাস শেষ করেই পরের চাষবাসের কাজে নেমে যায়। দিনমজুর হিসেবে কাজ করে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে। কলকারখানা ও কয়লাখনিতেও অনেক সাঁওতালদেরকে আমরা কাজ করতে দেখতে পাই। এছাড়াও অফিস, আদালত, হাসপাতাল, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানেও সাঁওতাল সমাজের মানুষজনকে কাজ করতে লক্ষ করা যায়।

বিক্ষিপ্তভাবে কিছু পরিবার যে জেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে সেখানে অনেক সময় কিছু মানুষজন সাহায্য করতে যান। সরকারের দিক থেকে কোনো মানুষ সেখানে গেলে তাঁদের প্রতি খুব বিনম্রভাবে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষজন নিজেদের জীবনযাপনের চিত্রগুলি তুলে ধরেন। এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে তারা আর সীমাবদ্ধতায় থাকতে চায় না। তাঁরা আসতে চায় লোকচক্ষুর সম্মুখে। নিজেদেরকে ফিরিয়ে আনার এই যে অসীম প্রচেষ্টা সেটাতেও কোথাও যেন আশার আলো উঁকি দেয়। এছাড়াও কোনো কোনো স্থানে তাদের সমাজকে নিয়ে দুই একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক। সেখানেও তারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার বিষয়গুলো অকপটে তুলে ধরে।

একসময় ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে আগামী দেড়শ বছরের মধ্যে সাঁওতালি ভাষা বিলুপ্ত হবে। বর্তমানে আমরা যা দেখতে পাই তা হলো সাঁওতাল সম্প্রদায় নিজেদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বাঁচানোর জন্য যেভাবে আন্দোলনের সম্মুখীন হয়েছে তাতে স্পষ্ট তাদের ঐতিহ্য তারা অবশ্যই টিকিয়ে রাখবে। এই ভাষার সাহিত্যও একটি অন্যান্য স্থায়ী ভাষা সাহিত্যের মতোই স্থায়িত্ব পাবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আলোচনার অন্তিম পর্যায়ে এসে একথা বলা যায় যে, এই সম্প্রদায় যে খুব বেশি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে তা একেবারে বলা যায় না। তবে সময়ের ক্ষেত্রে হোক বা বিবর্তিত সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ

করেই হোক তারা নিজেদেরকে সমকালীন প্রেক্ষাপটের সমান্তরালে প্রতিষ্ঠিত করার আশ্রয় চেষ্টা করে চলেছে। নিজেদেরকে কোথাও যেন আধুনিক সমাজের ন্যায় গড়ে তোলার পক্ষপাতি কিন্তু তারা অপারগ। এই অপারগকে পারগতায় নিয়ে আসতে হলে আমাদের সকলকেই তাদের সহানুভূতির চোখে দেখা, তাদের প্রতি হাত বাড়ানো, তাদেরকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া — এই বিষয়গুলি যদি আমরা আপামোর জনসাধারণ করতে পারি তাহলে একদিন সাঁওতাল সম্প্রদায় বর্তমান প্রেক্ষাপটের মহিরুহ হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র:

১. ‘অহল্যাভূমি পুরুলিয়া (দ্বিতীয় পর্ব)’, দেবপ্রসাদ জানা (সম্পাদিত), দীপ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৩১
২. ওই, পৃ. ৩১-৩২

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ‘রাড়ের লোকসংস্কৃতি’, নন্দদুলাল আচার্য, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৩
২. ‘বাংলার জনজাতি (প্রথম খণ্ড)’, প্রদ্যোত ঘোষ, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭
৩. ‘পুরুলিয়ার ইতিহাস’, কমল চৌধুরী, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৮
৪. ‘অহল্যাভূমি পুরুলিয়া (দ্বিতীয় পর্ব)’, দেবপ্রসাদ জানা (সম্পাদিত); দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৪
৫. ‘ঐতিহ্যে উত্তরাধিকারে পুরুলিয়ার রুক’, ব্রতীন দেওঘরিয়া, চক্রবর্তী অ্যান্ড সন্স পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ২০২২
৬. ‘বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ’, সুবোধ দেবসেন, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০
৭. ‘মানভূম লোক সংস্কৃতির বিবিধ প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড)’, বিজয় পান্ডা, অনূজ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ২০ জানুয়ারি ২০১০
৮. ‘পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (প্রথম খণ্ড)’, ধীরেন্দ্রনাথ বাক্সে, বাক্সে পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৮৭
৯. ‘সাঁওতাল সমাজের বিবাহ ও বিবাহের গান’, মোহন পাল, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৬
১০. ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড)’, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৯
১১. ‘ঝাড়খণ্ডের জনজাতি: সমাজ ও সংস্কৃতি’, নন্দকুমার বেরা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ২০২১
১২. ‘পুরুলিয়া’, তরুণদেব ভট্টাচার্য, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬
১৩. ‘পুরুলিয়া লোকসাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা’, দয়াময় মন্ডল, গ্রন্থবিকাশ, প্রথম প্রকাশ মে ২০১৭
১৪. ‘বাজালির ইতিহাস (আদি পর্ব)’, নীহাররঞ্জন রায়, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬
১৫. ‘বাজালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)’, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৯৪০

সহায়ক পত্রপত্রিকা:

১. ‘অড় পত্রিকা’, রমানাথ দাস (সম্পাদিত), জনজাতি বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা ২০০৪
২. ‘অনুজ’, সুভাষ রায় (সম্পাদিত), ২৫তম বর্ষ, শারদ সংখ্যা ১৪১৭, বর্গালী
৩. ‘স্বদেশচর্চা লোক’, প্রণব সরকার, গোষ্ঠী, সমাজ, সম্প্রদায় ১, শারদ ১৪২০

লেখক পরিচিতি: স্বপন কুমার, বাংলা বিভাগ (S.A.C.T.), নেতাজী সুভাষ আশ্রম মহাবিদ্যালয়, সুইসা, পুরুলিয়া।